18-11-49

ইষ্টার্ণ টকিজের

সশ্রদ্ধ নিবেদন

চন্দ্রা দেবী

অভিনীত

পরশ পাথর

কাহিনী ও পরিচালনা

সুরেন্দ্র রঞ্জন সরকার

পরিবেশক :— ইষ্টার্ণ টকিজ লিমিটেড

ইষ্টার্ণ টকীজের সশ্রদ্ধ নিবেদন

পরশ পাথর

কাহিনী ও পরিচালনা : **সুরেন্দ্র রঞ্জন সরকার**

গীতকার : **কবি শৈলেন রায়**
নৃত্যপরিচালনা : অতীন লাল ও ললিত কুমার
চিত্রশিল্পী : বিভূতি দাস
শব্দযন্ত্রী : পরিতোষ বসু
শিল্প-নির্দ্দেশক : নির্ম্মল মেহেরা
রূপসজ্জা : সুধীর দত্ত
আলোক সম্পাত : বিমল দাস
সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ বন্দোপাধ্যায়

সুরশিল্পী : পবিত্র চট্টোপাধ্যায়
ও
গৌরী কেদার ভট্টাচার্য্য
ব্যবস্থাপনা : পশুপতি কুণ্ডু
রাসায়নিক : জগৎ রায়চৌধুরী
স্থির-চিত্রশিল্পী : সমর বন্দ্যোপাধ্যায়
সজ্জাকর : সন্তোষ নাথ
যন্ত্র-সঙ্গীত : সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা

—সহকারীবৃন্দ—

পরিচালনায় : অমিয় ঘোষ, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্ম্মল সরকার, কনক বরণ সেন, সুধীর মুখোপাধ্যায় ও সন্তোষ সেনগুপ্ত।

চিত্রগ্রহনে : সুধাংশু ঘোষ, বীরেন কুশারী ও চুনীলাল চট্টোপাধ্যায়।

শব্দগ্রহনে : দুর্গাদাস মিত্র ও জগদীশ চক্রবর্ত্তী।

রসায়নাগারে : নিরঞ্জন সাহা, ভগবন্ধু বসু, প্রফুল্ল মুখার্জি, দুর্গাদাস বোস ও নবকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

ব্যবস্থাপনায় : অতুল স্বর্ণকার।

রূপসজ্জা : সুরেশ রায়।

আলোক সম্পাতে : রবীন, লালমোহন, বিজয়, নিত্যানন্দ, ইন্দ্রমনি, লক্ষ্মীনারায়ণ ও হরি।

সম্পাদনায় : মুকুন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শিল্প-নির্দ্দেশে : মদন গুপ্ত।

প্রধান চরিত্রগুলিতে রূপ দিয়েছেন :—

বিকাশ রায়, সন্তোষ সিংহ, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্ত্তী, নবদ্বীপ, নৃপতি, হরিধন, পশুপতি, শিবশঙ্কর, জয়নারায়ণ, সরোজ, আশু প্রভৃতি

ও

ছন্দা, বনানী, অপর্ণা, রাজলক্ষ্মী, বীণা, সন্ধ্যাদেবী প্রভৃতি।

নিজস্ব ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও হাউস্টন অটোমেটিকে পরিস্ফুটিত।

পরশ পাথর !

উত্তপ্ত মস্তিষ্কের অবাস্তব কল্পনা ?

কিন্তু কাজল যে বলে তারই কাছে পরশ পাথর আছে—শুধু যে বলে তাই নয়, সেদিন তার ঝি-এর একটা তামার পয়সাকে সোনা করেও দিয়েছে।

অসম্ভব ? বোধহয় তাই—কিন্তু কাজলকে অবিশ্বাস করার আগে তাকে, ভালো করে জানা দরকার আর তাকে বুঝতে ভুল হবারও কোন ভয় নেই—শুধু যে সমস্ত দুর্ঘটনাগুলি অপ্রস্তুত অবস্থায় সেই অশিক্ষিতা, সহজ, সরল গ্রাম্য মেয়েটির জীবনকে বিপর্য্যস্ত করে দিয়েছিল সেই ঘটনাগুলির উপর নির্ভর করেই কাজলের সত্যিকারের পরিচয় পাওয়া যায়।

একটানা সুখেই কেটেছে তার কৈশোর পর্য্যন্ত ; সামান্য নায়েব সুধীরের মেয়ে হয়েও একমাত্র সন্তান বলে খুব বেশী আদর-যত্নেই সে বড় হয়েছে। তার বাবা-মা তাকে শুধু আদরই দিয়েছে এই ভয়ে যে 'গরীবের মেয়ে বিয়ের পরে ত অনেক কষ্টই পাবে' কিন্তু যখন সেই গ্রামেরই জমিদারের বৌ তার ছেলে অমরের সঙ্গে কাজলের বিয়ে দেবেন বলে কথা দিলেন তখন তার বাপ মা ভাবলে তাদের একমাত্র আকর্ষণ কাজল কি সৌভাগ্য নিয়েই না তাদের ঘরে এসেছে।

এ বিয়েতে অমরের বাবার কিন্তু মত নেই—বি, এ, পাশ অমরের বিয়েতে অনেক কিছু পাবার আশা তাঁর আছে, তাই তিনি যখন দেখলেন যে অমর ছুটিতে দেশে এসে সারাদিন

শুধু কাজলদের বাড়ীতেই থাকে তখন কি করে কাজলের হাত থেকে অমরকে উদ্ধার করা যায় তারই উপায় খুঁজতে লাগলেন। সুযোগও জুটে গেল, অমরের মামা বিলেত যাবার আগে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। অমরের বাবা তারই সঙ্গে একাউন্‌টেন্‌সী শেখবার জন্যে অমরকেও সেইদিন বিলেত পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। অমর কাজলকে ছেড়ে তিন বছরের জন্যে বিলেত যেতে রাজী নয়, কিন্তু তার বাবাও ছাড়বার পাত্র নয়—নিশ্চিত কলহের হাত থেকে তাদের বাঁচায় অমরের মা। অমরকে বুঝিয়ে তিনি বলেন যে কাজলের বাপ-মাকে বুঝিয়ে তিনি রাখবেন—অমর বিলেত থেকে ফিরে এলেই বিয়ে হবে, "তিন বছর দেখতে দেখতেই কেটে যাবে ফিরে এসে দেখবি সব ঠিক এমনিই আছে"। অগত্যা অমর রাজী হয়। ষ্টেশনে যাবার পথে কাজলকে বুঝিয়ে বলবার জন্যে তাদের বাড়ী যায় কিন্তু দেখা হয় না—কাজল তখন তারই জন্যে মিত্তিরদের বাগানে পেয়ারা পাড়তে ব্যস্ত। পেয়ারা নিয়ে এসে শোনে যে বিশেষ কি দরকারী কথা বলবার জন্যে অমর এসেছিল—আর আজই সে বিলেত যাবার জন্যে কলকাতায় যাচ্ছে, তিন বছর পরে ফিরবে। শুনেই কাজল ছোটে ষ্টেশনে কিন্তু অমরের সঙ্গে দেখা হবার আগেই ট্রেন চলে যায়। অমরের দরকারী কথাটী তার শোনা চাই—তাই বাড়ী ফিরেই তার বাবা-মাকে বলে তাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে। আদুরে মেয়ের আব্দার ভেবে তাকে ভোলাবার জন্যে সুধীর বলে যে আদায়ের সময় তার যাওয়া সম্ভব নয়। কাজল বলে :— 'আমি কিন্তু কাল ভুলুদার সঙ্গে যাবো'। ভুলু চাষের ক্ষতি ক'রে যেতে পারবে না ভেবে তাতেই মত দেয়। কাজল সারারাত্রি না ঘুমিয়ে ভোর বেলাতেই ভুলুকে বুঝিয়ে কলকাতায় যায়—ভুলু কখনও কলকাতা দেখেনি তাই খুব সহজেই রাজী হয়ে যায়। পথে মনে পড়ে যে অমরের ঠিকানাটা নেওয়া হয়নি—"ও আমি ঠিক খুঁজে নেব" বলে ভরসা দিয়ে ভুলু ট্রেনে চড়ে। কলকাতায় পৌঁছে সারাদিন ঘুরেও তারা সোনার-মেডেল-পাওয়া অমরের বাড়ী খুঁজে পেলে না—অমরকে পাওয়ার আর কোন সম্ভাবনা নেই দেখে তারা ফিরে যাবে ঠিক করে। এমন সময় ক্যাস্তর মা জগদীশ-পুরের জমিদারের ছেলে অমরকে চেনে বলে তাদের সঙ্গে করে কুখ্যাত পল্লীতে তার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে ভুলুকে ষড়যন্ত্র করে সরিয়ে দিয়ে কাজলকে অন্য বাড়ীতে আটকে রাখে। ভুলু অনেক কষ্টে কাজলকে উদ্ধার ক'রে তিন দিন পরে দেশে ফিরে যায়।

ওদিকে কাজল ফিরলো না দেখে গাঁয়ের লোকেরা সুধীরকে প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যে জোর করতে লাগলো—আর বিধানও দিয়ে গেল যে কাজল যদি কখনও ফিরে আসে তাহলেও

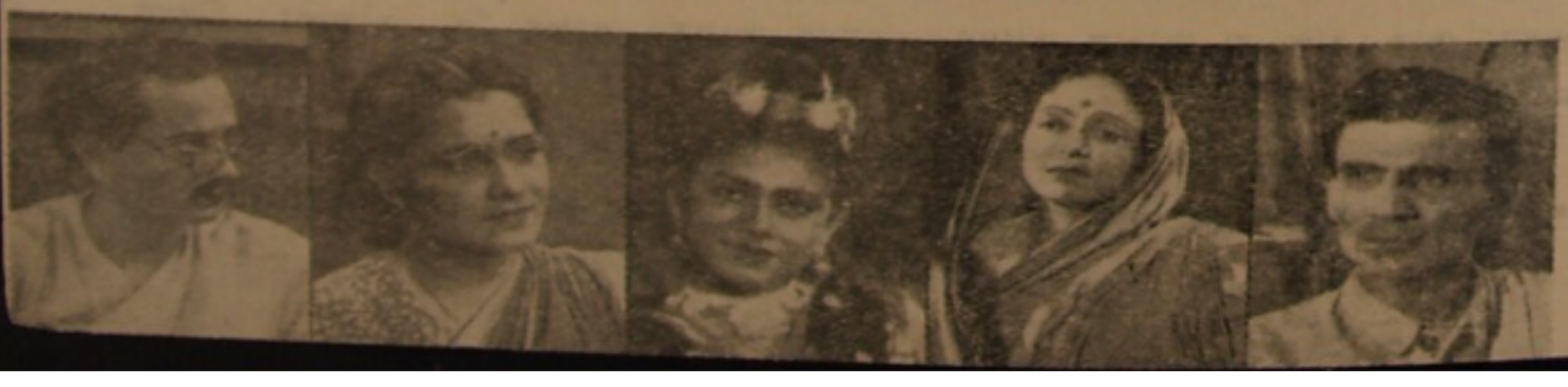

তাকে আর বাড়ীতে থাকতে দিতে সে পারবে না। রাগে অভিমানে সুধীর বাড়ী পুড়িয়ে দিয়ে চলে যায়। কাজলেরা ফিরে এসে খবরও পায় না যে তারা কোথায় গেছে। ভুলু কাজলকে নিয়ে যায় জমিদার বাড়ীতে—তাদের ভাবী বৌ, তারা নিশ্চয়ই তাকে আশ্রয় দেবে, এই তার বিশ্বাস। পাছে কাজলকে বাড়ীতে রেখে তার স্ত্রী অনর্থ ঘটায় এই আশঙ্কায় জমিদার ছোটে তাদের দিকে—পথের মোড়েই হয় দেখা, নিষ্ঠুর আঘাত ক'রে তাদের সে ফিরিয়ে দেয়।

আজন্ম সুখে লালিত কাজল হ'ল আশ্রয়হীনা—বাবা, মা কেথায় সে জানে না—অমর বিলাতের পথে, তিন বছর পরে ফিরবে।

আশ্রয় সে পেল। অমরের যোগ্য ক'রে নিজেকে গ'ড়ে তোলার সাধনায় কাটালো তিন বছর। কিন্তু অমর ফেরার পরে তাদের প্রথম দেখাতেই কাজল বুঝল তার প্রতীক্ষা হয়েছে বিফল, যে অমরকে সে ভালবাসে এ-সে অমর নয়, বিলাতী শিক্ষায় বদলে গেছে সে। তার বাবার সম্পত্তির ভাগ হারাবার ভয়ে কাজলকে বিয়ে কর্ত্তে পারবে না তবে তার ভার সে নেবে আর কাজলকে বুঝিয়ে বলে "এতে দোষের কিছু নেই বিলেতে এরকম চলে"।

অমরের ইঙ্গিতে ঘৃণায়, গ্লানিতে অধীর হ'য়ে পড়ে কাজল—অপমান করে তাড়িয়ে দেয় অমরকে।

অমরের সঙ্গে সঙ্গেই চলে যায় তার সব আশা—ভেঙ্গে যায় তার সব স্বপ্ন। রাস্তা থেকে এনে যিনি তাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন—নিজের বোনের মত করেই তিন বছর ধরে যিনি তাকে পালন ক'রেছেন, নিজের দিদির মতই যাকে সে ভক্তি করত তাঁর আশ্রয় ছেড়েও সে চলে যায় "অমরের বাবার চেয়েও বড়লোক হতে"। ভুলু বাধা দেয়, বোঝায়—কিন্তু তার পরামর্শ কাজলের মনের ঝড়ের হাওয়ায় ভেসে যায়—সকলের কথা অবজ্ঞা ক'রে শুধু বড়লোক হবার জন্যেই কাজল ছুটলো দিক্‌ভ্রান্ত হ'য়ে।

ভুলু ভাবে কাজলের বাবা-মাকে খুঁজে বের ক'রতে পারলেই সব গোলমালের অবসান হবে। কিন্তু কোথায় পাবে তাঁদের? তা সে ভাবতে চায় না—সেও চললো যেমন ক'রেই হোক তাঁদের খুঁজে বের করতে।

কার খোঁজা হ'ল সার্থক? কেমন করে কাজল পেল পরশ-পাথরের সন্ধান? ঘটনা-বহুল এসব প্রশ্নের উত্তর সংক্ষিপ্ত ভাবে দিলে কাজলকে ঠিক চেনা যাবে না—ছবি দেখেই তাকে চিনুন, তাকে বিচার করুন।

(১)

বুকের মাঝে যে গান ওঠে দুলে দুলে।
বসন্তে যে রূপ নিল সে ফুলে ফুলে গো ফুলে ফুলে॥
ফুল বলে গো দেবার লাগি উচ্ছলিয়া।
পথের পাশে রয় যে চেয়ে ব্যাকুল হিয়া॥
তোর লাগি যে আপনারে যাই ভুলে
বুকের মাঝে যে গান ওঠে দুলে দুলে
ধূপ বলে গো আগুন তাঁরে জানিয়ে দিলো
বুকের মাঝে গন্ধটুকু লুকিয়ে ছিলো
মনের মাঝে হঠাৎ জেগে মন যেন কয়।
কে জানিত প্রাণের মাঝে সে শুধু রয়॥
শতদলের দলগুলি যায় খুলে খুলে
বুকের মাঝে যে গান ওঠে দুলে দুলে
বসন্তে যে রূপ নিল সে ফুলে ফুলে গো ফুলে॥

(২)

ফাগুনের বাঁশিতে কুহুমের হাসিতে
সে আমারে ডাকলো রে ডাকলো
জাগলোরে মন আমার জাগলো,
ফাগুনের বাঁশিতে।
ধন্য হে পিয়াসী ধন্য হে ধন্য
মোর বুকে কাঁদে প্রেম সে তোমার জন্য
পরাণের তীর্থে আজি মোর চিত্তে
নৃত্যের তালে তালে একি দোল লাগলো
একি দোল লাগলো
ফাগুনের বাঁশিতে।
উতলা ঝরণা বলে সাগরে যে ধরিতে
পাহাড়ের বুক ভেঙ্গে আমি চাই ঝরিতে॥
তুমি মোর তুমি মোর হে চির আনন্দ
স্বপনের পারিজাতে জাগলো যে গন্ধ
তোমারি আভাসে হৃদয়ের আকাশে
রঙে রঙে রামধনু অনুরাগে রাঙ্গলো।
অনুরাগে রাঙ্গলো।
ফাগুনের বাঁশিতে কুহুমের হাসিতে॥

(৩)

কুহুমেরে ঘিরি রাঙা প্রজাপতি স্বপনে ওড়ে।
ফুল বলে হায় কিবা আছে মোর কী দিব তোরে।
তুমি এলে কাছে সুরভি আমার নাই
তোমার লাগিয়া মধু বল কোথা পাই
আমি মধু বল কোথা পাই।
মোর আমি নাই তবু কেন হায় চাহিছ মোরে।
কুহুমেরে ঘিরি রাঙা প্রজাপতি স্বপনে ওড়ে
তোমার ক্ষণিক এ ভাল লাগায় আমারও লেগেছে ভালো।
মণি মুকুরের স্বপনে জেগেছে
জেগেছে রূপের আলো
আমারও লেগেছে ভালো।
শিখা—বলে হায় পতঙ্গ এলে কাছে
তব লাগি মোর হৃদয়ের জ্বালা আছে।
তোমারে বাঁধিব আমার প্রাণের অনল ডোরে
তবু কেন হায় চাহিছ মোরে
কুহুমেরে ঘিরি রাঙা প্রজাপতি স্বপনে ওড়ে।

(৪)

গোলাপের দিন এলো ফিরে এলো বুলবুল
এলো মোর পরাণ পিয়া
দোলে মোর হিয়া গো দোলে মোর হিয়া
গোলাপের দিন এলো ফিরে এলো বুলবুল
হৃদয়ের তালগুলি চরণের ছন্দে
মায়া মৃগ ধরা দিল প্রাণের বসন্তে।

নূপুরের রিনি রিনি কঙ্কন কিনি কিনি
সুরে সুরে বাজে তাই—রণিয়া রণিয়া—
ওগো মোর চঞ্চল এলো চামেলীর দিন
বেঁধেছি—তোমার লাগি আজি মোর মনোবীন্
এ জীবনে বাজে শুধু তোমারি যে রাগিণী
তব অনুরাগে রাঙা আমি অনুরাগিণী
প্রাণ ঝরণার তালে জীবনের কলগানে
হৃদয়ের কথা যাই বলিয়া বলিয়া
দোলে মোর হিয়া গো দোলে মোর হিয়া।

(৫)

অনঞ্জনা নদীর ধারে বাঁধবো
বাঁধবো শুধু একটী ছোট বাসা।
এই জীবনেই করেছিলাম আশা
বাঁধবো শুধু আমি বাঁধবো শুধু একটী ছোট বাসা॥
সন্ধ্যা-সকাল আলো ছায়ার খেলায় খেলায়
দিনগুলি মোর আসবে যাবে রঙিন খেয়ায়।
দুয়ার পথে রাখাল না হায় রাজার ছেলে
জানিয়ে যারে আঁখির পিপাসা
বাঁধবো শুধু আমি বাঁধবো শুধু একটী ছোট বাসা॥
সফল হবে ফুল ফোটানো মৌমাছিদের সুরে
কাছের মানুষ রবে না আর রবে না আর দূরে
স্বপ্নে দেখি সেই তো' আমারি বকুল শাখায়
বাসা বাঁধার গান ধরেছে পাখীরা হায়
আজও জাগি স্বপন ভাঙ্গার বেদন লয়ে
নীড় রচনা হায়রে দুরাশা।

(৬)

আমি আঁধারের পথে চলি দীপ জ্বালাতে
শুধু দীপ জ্বালাতে
আমি আশাহারা মনে চাহি আশা জাগাতে
আর দীপ জ্বালাতে
আমি গগনে যে জ্বালি সুখে তারা দীপালী—
আর ঘুমে ভরা নিশীথের ভাঙ্গি নিদালী—
আমি গানে গানে চাই শুধু প্রাণ রাঙাতে
আর দীপ জ্বালাতে
আমি হিম ঋতু গেলে আনি ফাগুনের ফুল
আমি গানে মাতোয়ারা বন বুলবুল
গো বন বুলবুল
মোর আবেশে যে দোলা লাগে ফুল শাখাতে
চাহি দীপ জ্বালাতে
আমি আলোকের লীলা সাথী আনি প্রভাতে
আর পুলকের ফুলঝুরি হাসি ছড়াতে
ওগো কাঁদিতে যে চাহে তারে চাহি হাসাতে
আমি দীপ জ্বালাতে
আঁধারের পথে চলি দীপ জ্বালাতে
শুধু দীপজ্বালাতে।

ইষ্টার্ণ টকীজের পরিবেশনায় আসিতেছে :—

ইওর ফিলিমের

একই গ্রামের ছেলে

রচনা ও পরিচালনা—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

সঙ্গীত পরিচালনা—শৈলেশ দত্তগুপ্ত

ঃ রূপায়নে ঃ

ধীরাজ, জহর, মনোরঞ্জন, রবীন, পশুপতি, মণি, সন্তোষ, পঞ্চানন,
মীরা মিশ্র, সাবিত্রী, আশা, সন্ধ্যা, মায়া প্রভৃতি।

সাহসিকা

রচনা ও পরিচালনা—প্রেমেন্দ্র মিত্র

সঙ্গীত পরিচালনা—পবিত্র চট্টোপাধ্যায়

ঃ রূপায়নে ঃ

ছন্দা, রেবা, পূর্ণিমা, ধীরাজ, অবনী, নবদ্বীপ প্রভৃতি।

ইষ্টার্ণ টকীজের

ছন্দাদেবী অভিনীত—

অনুরাগ

পরিচালনা—অমিয় কুমার ঘোষ

কাহিনী—সুরেন্দ্র রঞ্জন সরকার

Published by Eastern Talkies Limited & printed at Prosanna Printing Press
26, Bose Para Lane, Baghbazar, Calcutta.

মূল্য দুই আনা